Rs. 2.00

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মূল্য ঃ ২ টাকা

মাসিক

Vol : IX Issue : VII, 15th, October, 2020 কার্ত্তিক, ১৪২৯, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

১ অক্টোবর 'বিশ্ব প্রবীণ দিবস' উপলক্ষে আমদের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের পরম্পরা রক্ষা করা গেল না। আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

বিশ্ব প্রবীণ দিবস যেন বড় বেশি শহরকেন্দ্রিক। ভারতের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য গরিব বয়স্ক নর-নারী আমাদের আগ্রহের বাইরে থেকে যাচ্ছে। যত সেমিনার, যত গবেষণা সবই শহরের মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত প্রবীণদের নিয়ে। তাই আমাদের দাবী সার্বজনীন পেনসন এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি।

গত মাসে বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবর্ষ পূর্ণ হল। এই 'লিলিপুটের' দেশে সেই সুবিশাল পুরুষের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

আনলক '৫' পর্বে করোনার ক্ষমতা কমার কোনো লক্ষণ নেই। তাই বিধি নিষেধ মেনে চলুন, আসন্ন শারোদৎসব আনন্দে কাটান।

পরিশেষে বলি, সম্পাদনার জরুরিকালীন স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা এখনও চলছে। তাই এই সংখ্যার জন্যও সম্পাদকমণ্ডলীকে দায়ী করা উচিত হবে না। আশা করি, অচিরেই অবস্থার পরিবর্তন হবে।

শোকপ্রস্তাব

বিগত সম্মেলনের পর যে সকল সদস্য শুভানুধ্যায়ীদের আমরা হারিয়েছি, তাদের প্রতি রইল আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য। যাদের নাম আমরা জানতে পেরেছি—

১) অমিতাভ মুখার্জী (সদস্য)
২) মঞ্জুশ্রী দাস (সদস্য)
৩) চুণীলাল সাহা (জয়া)
৪) জহরলাল কর্মকার (জয়া)
৫) অজিত রাম (সদস্য)
৬) গীতা দে (সদস্য)
৭) রণজিত দত্ত (সদস্য)
৮) তপন কুমার মিত্র (সদস্য)
৯) নির্মল সরকার (জয়া)
১০) সুনীল দাস (জয়া)
১১) অমল মান্না (জয়া)
১২) অশোককুমার দত্ত (জয়া)
১৩) প্রদীপ সাহা (সদস্য)
১৪) শিশির দাস (জয়া)
১৫) গীতা চক্রবর্ত্তী (২০১৮-য়ে সম্মানিত)
১৬) ডা: জি. পি. দত্ত (এ্যাডভাইসরী বোর্ড সদস্য)
১৭) অহিন্দ্রনাথ সাহা (সদস্য)
১৮) তুষার পঞ্চানন (সদস্য)
১৯) ঊষা গাঙ্গুলী (সদস্য)
২০) শশীকান্ত মোদক (জয়া)
২১) হিমাণী সেন (সদস্য)
২২) পিনাকীসখা দেবনাথ (সদস্য)

১ অক্টোবরের ভাবনা

পেলব মুখার্জী

প্রবীণ নাগরিক দিবসে আপনাদের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা। ঠিক একবছর আগের কথা মনে পড়ে। আমি সস্ত্রীক বালুরঘাট শহরে গিয়েছিলাম। বিকেল বেলা পৌছেই স্টেশন থেকে সরাসরি উপস্থিত হই মিউনিসিপ্যালটির কাছে একটি হলে, যেখানে বালুরঘাটের প্রবীণ নাগরিক সভা প্রবীণ নাগরিক দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে সভার আয়োজন করেছিল। প্রায় ৩ শতাধিক লোকের উপস্থিতি ছিল সেখানে। শুধু সভাই তাঁরা করেননি, সকাল থেকে প্রবীণদের আয়োজিত নানাবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবীণ্রা যে উপেক্ষিত নয়, তারা বয়স হলেও সমাজ সংস্কারে একত্রিত হয়ে তারা অবহেলিত নয় একথা জোরের সাথে প্রচার করে। খুবই উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করেছি।

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন প্রতি বছরই আমরা প্রবীণ নাগরিক দিবসে আলোচনা সভা সংগঠিত করে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আলোচনা করে থাকি। গত বছরও হয়েছে। শুধু আমরা নয়, সারা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন সংগঠন নিজ নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। কিন্তু এবার করোনা সংক্রমণে কি অবস্থা হয়েছে সে আর কি বলব? আসল কথা হল প্রবীণদের উপরেই আক্রমণের থাবা সবচেয়ে বেশি। কোথাও কোন কাজ-কর্ম করার উপায় নেই। সভা সমাবেশ বা একসাথে হয়ে অন্য কোন কর্মসূচী, কোনটাই করা যাচ্ছে না। ফোরামের সম্পাদক চঞ্চল শিকদার আমাকে ফোনে জানিয়েছেন এই অবস্থায় ফোরামের যে কর্মসূচী ছিল তা বন্ধ করতে হয়েছে। এমতাবস্থায় ১ অক্টোবরের যা যা করার পরিকল্পনা তাদের ছিল তাও করা হয়ত সম্ভব হবে না। আমি তাকে বলেছি এতে কারও কিছু হাত নেই। করোনা আছে থাকবে, করোনাকে নিয়েই আমাদের চলতে হবে। আমরা দৈনিক অফিস না খুললেও সপ্তাহে ৩দিন ১১টা থেকে যোগাযোগের জন্য খুলে রাখি। আমাদের মুখপত্র প্রবীণবার্তা এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২০ এর মধ্যে ছাপিয়ে বিলি বণ্টন করার ব্যবস্থা করছি। ডাক বিভাগের ডাক বিলি ব্যবস্থা শিকেয় উঠেছে। কোন কিছুই করা যাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও আমরা প্রতি মাসের কাগজ তাদের দপ্তরে জমা দিয়েছি। তারা বলছেন যে দেরি হলেও নিশ্চয়ই সেগুলো বিলি হবে। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে পথে আমরা চলছি তা নিশ্চয়ই আগামী দিনে চলার পথে একটা নজির হয়ে থাকবে। আমরা করোনাকে পরাস্ত করে আমাদের লক্ষে নিশ্চয়ই পৌছাতে পারব।

আমরা বিগত ২১ ডিসেম্বর সারা রাজ্যব্যাপী প্রবীণ নাগরিকদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেছিলাম। তাতে একটি দাবীপত্রও কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে ও রাজ্য সরকারের দপ্তরে (নবান্ন) দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। রাজ্য সরকারের দপ্তরে চিঠি মারফৎ ব্যক্তিগতভাবে ডাকযোগে জমা দেওয়া সম্ভব হলেও, সংগঠনগতভাবে এ চিঠি জমা দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি করোনা আবহে। উক্ত সম্মেলনে মোট ১৮টি প্রবীণদের সংগঠনের ৮৬ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

এই সময় আমাদের উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও, কর্মসূচী স্থগিত রাখতে হয়। সরকারি নির্দেশ মেনেই আমাদের চলতে হচ্ছে। বিস্তারিতভাবে জানাতে গেলে আপনাদের জানতে হবে চিঠিটির বিষয়বস্তু কি ছিল। তা আপনাদের অবগতির জন্য আমি জানানোর চেষ্টা করছি।

প্রবীণদের দাবী

১) অবিলম্বে প্রবীণ-রাজ্য-নীতি (State Policy for Older Persons) ঘোষণা।

২) নূন্যতম মাসিক ছয় হাজার টাকা সার্বজনীন পেনশন।

৩) কেন্দ্রের প্রস্তাবিত Maintenance & Welfare Of Parents & Senior Citizen Act, 2007 সংশোধিত হলে অবিলম্বে রাজ্যস্তরে প্রয়োগ করতে হবে।

৪) প্রবীণদের নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি জেলার প্রতিটি থানায় (প্রণাম/সাঁঝবাতির মতো) কার্যকরী ব্যবস্থা।

৫) বাসে/মিনিবাসে কমপক্ষে ৪টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা। অবিলম্বে প্রবীণবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা (বসার আসন, ধরার হ্যাণ্ডেল, পাদানি প্রভৃতি) চালু করতে হবে।

৬) স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে সকল প্রবীণ নাগরিকের অন্তর্ভুক্তিকরণ।

৭) ব্লকস্তরে বৃদ্ধাবাস স্থাপন এবং বেসরকারি বৃদ্ধাবাসগুলির জন্য আইন প্রণয়ন।

৮) প্রবীণদের কল্যাণমূলক আইনসমূহের ব্যাপক প্রচার।

৯) প্রবীণদের অন্যান্য দাবীসমূহের সুমীমাংসার জন্য ব্যবস্থা।

শুধুমাত্র করোনার আক্রমণই নয় এই সময় আমাদের রাজ্যের উপরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে এসেছে বারে বারে। আমফানের আক্রমণসহ ঝড়ঝঞ্ঝা লাগাতার হয়েছে আগস্ট মাস অবধি। আমফানের দাপটে জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্তই শুধু হয়নি, সাথে আমফান রিলিফের দুর্নীতি, গৃহনির্মাণের জন্য সরকারি রিলিফ লুট ইত্যাদি নানা অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয় যারা টাকা লুটপাটে যুক্ত ছিলেন তাদের অপকীর্তি নজির হয়ে রয়েছে। তাদের অনেকেই মৌখিকভাবে প্রকাশ্যে তাদের অপরাধ স্বীকার করে লুঠ করা টাকা ফেরৎ দিয়েছেন। আমাদের প্রশ্ন হল টাকা ফেরৎ দিলেই কি অপরাধ মার্জনা হয়ে যাবে। এটা নিশ্চয়ই সরকার বিবেচনা করবেন। জনসাধারণের জীবন-মরণ সমস্যার সময় এভাবে অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এইসময়ে আমাদের অনেক সহকর্মীকেই আমরা হারিয়েছি। আমাদের অন্যতম সংগঠক, আমাদের পরিচালন পরিষদের সদস্য শশীকান্ত মোদকের কথা মনে পড়ে। যখন আমি চাকুরিতে যোগ দেই মোদকবাবু ইউনিয়নের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। তার সাহচর্য আমার চলার পথে প্রভুত সাহায্য করেছে। প্রয়াত মোদকবাবুকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই CITU-এর প্রাক্তণ সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী মহাশয়কে। ছাত্র আন্দোলন থেকে যে এক ঝাঁক তরুণ নেতৃত্ব উঠে আসেন, শ্যামলবাবু ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। আমাদের সদস্য, হিতাকাঙ্খী তুষার পঞ্চাননকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম। এরকম আরও যারা এই সময়ের মধ্যে করোনাসহ অন্যান্য কারণে প্রয়াত হয়েছেন তাদের সকলকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

আপনারা সকলে সুস্থ থাকুন, ভাল থাকুন। আতঙ্ক কাটিয়ে রুখে দাঁড়ান। আগামী দিন একটা সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়ে তোলার যে স্বপ্ন আমাদের প্রয়াত সভাপতি দেখিয়েছেন, তাকে নিশ্চয়ই আমরা সফল করে তুলতে পারব।

করোনা আবহে খুদে পড়ুয়াদের কণ্ঠ

প্রশান্ত কুমার ধর

আছে কি ভালো পড়ুয়ারা এই গভীর সংকট মুহূর্তে?
না, ভালো নেই তারা, বিদ্ধস্ত-বিষন্নতায় আক্রান্ত,
কেড়ে নিয়েছে তাদের সুন্দর পৃথিবী অতিমারী।
যাঁরা পিঠে হাতরেখে, দিয়েছেন মোদের মায়ের স্পর্শ।

মনে পড়ছে মোদের প্রতি মুহূর্তে, তাঁদের কথা,
প্রয়োজনে ছুটে যেতাম তাঁদের কাছে হাসিমুখে,
নালিশ করতে বা অন্য কিছুর তরে সংবাদ দিতে,
পরিস্থিতি গেছে বদলে, পড়েছে ঢুকে সতর্কতার বাণী।

বকুনি খেতাম দুষ্টুমির জন্যে, আদর পেতাম সন্তান তুল্য।
শুধুই কি পড়াশুনো-নিয়মানুবর্তিতা-সুঅভ্যাস-কর্তব্য পালন—,
সব শেখা হতো, দিদিমণিদের নজরদারিতে, পড়ে মনে বারে বারে,
ডুবে রয়েছি পারছিনা ভুলিতে বিদ্যালয়ের রূপ- রস-গন্ধ।

শিক্ষক-পড়ুয়াদের সম্পর্কের গণ্ডিতে পড়েছে ঢুকে অজানা শত্রু,
বিস্ফারিত চোখের অগ্নিবাণে তৈয়ারী হয়েছে দূরত্ব।
জানি না কবে আসবে সু-দিন, ভরে উঠবে পুষ্পেভরা বাগান,
অপেক্ষায় আছি, স্কুল শুরু হলে, ফিরে পাবো তো সবকিছু আবার?

যদিও করোনা

মৃণাল দত্ত

আমার স্বদেশে অব্যাহত করোনা মিছিল
মরুভূমিতে আই.পি.এলের বর্ণচ্ছটা
দর্শকশূন্য আসন, কতিপয় ভি আই পি
মহামান্য ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমিক
হৈ হৈ রৈ রৈ হাততালি দেয়
নিলামে কেনা খেলোয়াড়দের
চার ও ছক্কার যুগলবন্দিতে।
মহার্ঘ বিজ্ঞাপনে শুভশ্রী হাসি
কোটিপতি অভিনেতা অভিনেত্রীর
করোনা-বিবর্ণ ভারতে হাসির ফুলঝুরি
অতিমারির আইসোলেশনে
টিভির রঙিন পর্দায়।

এক চিকিৎসক কোভিড রোগীর দিনলপি

ডাঃ মৃগেন গাঁতাইত

৩ আগস্ট, ২০২০ সোমবার রাত ১০-৩০ মিনিটে হঠাৎ বুকের মাঝখানে অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম, সেইসঙ্গে ঘেমে গেলাম, তখন খাচ্ছিলাম। মাথাটাও ঘুরতে লাগল। কোনরকমে কাত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বুকের অস্বস্তি চলছিল। বুঝতে পারলাম হার্টের একটা সমস্যা হচ্ছে। ভাবলাম হয়ত হার্টের স্ট্রোক শুরু হচ্ছে। সিদ্ধান্ত নিলাম হাসপাতালে যেতেই হবে। অক্সিমিটারে দেখলাম পালস্ খুব বেশি আর অক্সিজেন স্যাচুরেশন ৯০-৯২ হয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাব? যেহেতু হার্ট তাই ডিসানকে ফোন করলাম,

কোভিড আছে কিনা জিজ্ঞেস করল, ওরা বিশেষ কোন উত্তর দিল না। তখন সল্ট লেকের ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিকের কথাই ভাবলাম। ভগ্নীপতি ডাঃ বিজ্ঞানকে ফোন করলাম সওয়া ১১টা নাগাদ। কারণ কোভিড কি ননকোভিড এই নিয়ে হাসপাতালগুলো টালবাহানা করবে এই আশঙ্কা ছিল। বিজ্ঞান হাসপাতালে কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে বলল। ড্রাইভারকে ঘুম ভাঙিয়ে ওঠানো গেল। তখনো বেশ বৃষ্টি। ১২-২৩ মিনিটে গাড়ি রওনা হয়ে গেল, ১২-৫৫ নাগাদ হাসাপাতালে পৌঁছে গেলাম। ডাক্তারকে বলাই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইসিজি হল। হার্ট রেট অনেক বেশি ১১০। ডাক্তার বলল অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন অর্থাৎ হার্টের অনিয়ন্ত্রিত অনিয়মিত স্পন্দন। এর আগে আমার কখনো আমার হার্টের সমস্যা হয়নি। দ্রুত চ্যানেল করা হল। সঙ্গে সঙ্গে সিটি স্ক্যান করা হল। স্ক্যানে বিশেষ কিছুই ছিল না। আমাকে আই টি ইউতে ভর্তি করে দেওয়া হয়।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বুকের কষ্টটা একদম কমে গেল। ভাল লাগছিল। ভর্তির সময় দেখা গেল একটু জ্বর ছিল। বাড়ি থেকে বলে এসেছিল যে আমি প্রাকটিসের সময় এক কোভিড রোগীর সংস্পর্শে এসছিলাম। তাই অবশ্যই যেন কোভিড টেস্ট করা হয়। সকালে কোভিড পরীক্ষার নমুনা নেওয়া হল। ঐদিন মাঝরাতেই আমাকে আইটিইউ-এর স্পেশাল বেড থেকে জেনারেল বেডে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ডাক্তার বলল যদি কোভিড নেগেটিভ হয় তাহলে দুদিন আইসিইউ-তে রেখে ছেড়ে দেওয়া হবে। দুপুর নাগাদ কোভিড পজিটিভ রিপোর্ট এল। তখন একটু কাশি ছাড়া আমার আর কোন কষ্ট ছিল না। বিকালে কোভিড আইসোলেশন এক্সট্রা ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হল। একটু পরে আরো এক ডাক্তারও ঐ ওয়ার্ডে ভর্তি হল। শিশুমঙ্গল হাসপাতালের এম ডি করেছে সদ্য। ঐ ঘরে মোট পাঁচজন ছিলাম। কারোরই বিশেষ কষ্ট ছিল না। পরেরদিন দুপুরে বলা হল যে আমাকে আর ঐ ডাক্তারকে স্যাটেলাইট সেন্টার একটা হোটেলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ওখানে ডাক্তার নার্স থাকবে, রোগীরা নিজেরাই নিজেদের ওযুধ খাবে, মোবাইল ফোন থাকবে। ভালই হল। ভাবলাম তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাব, বিশেষ কষ্ট কিছুই হল না।

৬ তারিখে বৃহস্পতিবার বিকালে হোটেলে চলে গেলাম। প্রতি ঘরে একজন রোগী। হোটেলের তিনটে তলা ভাড়া নেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যাতেই বাড়ি থেকে মোবাইল ফোন আমার ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ঘরে টিভি আছে, এসি তো আছেই। পরেরদিন থেকে নতুন পর্ব শুরু হল। কাশিটা একটু একটু করে বাড়তে লাগল। কাশলে একটা হুইজ হত ট্র্যাকিয়ার কাছে। ভাবলাম মিউকোলাইট খেলে তরল হবে, কফ ওঠাতে সুবিধা হবে। অ্যাম্বরোলাইট দিল আমাকে। কিছুক্ষণ কাশার পরে এক থোকা সাদা কফ উঠে আসত। কিন্তু মিউকাস তৈরি যেন শেষ হত না। টিসু পেপারে কফটা ধরতাম। তারপরই শুরু হল আরেক বিড়ম্বনা। ক্ষিদে একদম চলে গেল। কোন কিছুই মুখে দিতে পারছি না। এমনকি বিস্কুটও না, পুরো খাবার ফেলে দিতাম। নিউট্রিশনের জন্য ওআরএস খাওয়া শুরু করলাম, দু এক ঢোক করে খেতাম। বিরাট আলস্য। বিছানা থেকে উঠব ভাবতে ভবতে ১৫ মিনিট লাগত উঠে পড়তে। আবার খাবার খেতে হবে ভাবতেই কষ্ট। তখন মনে হত বেঁচে থাকাটাই কত পরিশ্রমের, কত কষ্টের! বাঁচার আনন্দ তাহলে কোথায়! পেটে কোন কষ্ট নেই, কিন্তু কোন খাবারই মুখে ঢুকছে না। এমন সময় শুক্রবার সন্ধ্যায় হঠাৎ অনেকটা বমি হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে

যে খাবার খেয়েছিলাম সব খাবার উঠে গেল। স্টমাকটা একটা লম্বা চ্যানেলের অংশ। যার কাজ হল পরপর খাবারকে পরের অংশে পাঠানো। এ যেন গোঁসা করে বেরোবার দরজা বন্ধ করে দিয়ে নীলকণ্ঠের মতন স্টমাক সব ধারন করে বসে আছে। বমির পর পেটটা একটু হালকা লাগল। ভাবলাম বুঝি ইনফেকশন হয়েছে, তাই নার্সদের বলে ব্রেক ট্যাবলেট আনালাম। রাত্রে ব্রেক খলাম। ভাবলাম সকালে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। কিন্তু ক্ষিদের অবস্থা আরো খারাপ হতে লাগল। শনিবার সারাদিন শুধু চারটে বিস্কুট আর ওআরএস খেলাম। পাতলা পায়খানাও হল না। ভাবলাম স্টমাকের কোন মুভমেন্ট হচ্ছে না। স্টমাকের জি এম সি (গ্যাস্ট্রিক মোটিলিটি সেন্টার) যেন অকেজো হয়ে গেছে। ভাইরাস নিশ্চয় স্টমাককে আক্রমণ করেছে। রবিবারও একই অবস্থা চলল সোমবার সকালে হঠাৎ একবার খুব পাতলা পায়খানা হল। সঙ্গে মাথা ঘোরা শুরু হল। মাথা ঘোরা আমার পুরানো সমস্যা। কোভিডে সেটা চাড়া দিয়ে উঠল। ডাক্তারকে বললাম। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আবার হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি করে দেওয়া হল।

হাসপাতালে স্যালাইন চালিয়ে মনোসেফ অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হল। এছাড়া কোভিডের ওষুধ ভিটামিন সি আর জিঙ্ক, সেইসঙ্গে হার্টের ওষুধ। মোট ১৪টা ওষুধ। প্রতি দুজন রোগী পিছু একজন করে নার্স। আমার পাশে ছিল একজন ৯৫ বছরের, আরেকজন ৮১ বছরের রোগী তাদের ছিল জ্বর আর কাশি। সবাই মোটামুটি ভাল ছিল। ডাক্তাররা অত্যন্ত যত্ন সহকারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রত্যেক রোগীকে প্রতিদিন দুবেলা প্রায় আধঘণ্টা করে দেখতেন। রোগের বিরুদ্ধে আন্তরিক লড়াই। নার্সরাও ছিল অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, ওষুধ দেওয়া, ইউরিন পট আনানো, বাথরুমে যেতে সাহায্য করা, আগ্রহসহকারে খাওয়ানো সব কিছুই ছিল আন্তরিক। এই পরিবেশ সত্যিই রোগীকে চাঙ্গা করে।

আমার কোন জ্বর ছিল না। কিন্তু কাশিটা বাড়তেই লাগল। কিছুক্ষণ কাশার পরে একদলা সাদা কফ উঠত। মনে হত কফের ঐ ডেলাটা বেরিয়ে গেল, এবার আরাম পাব। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। আবার কাশি এবং একই রকম কফের ডেলা। এ যেন ফল্গু ধারার মতন ট্রাকিয়া ব্রঙ্কাস থকে সৃষ্ট হয়ে চলেছে। রেয়োয়াস সিরাপ দিয়েও বিশেষ কাজ হল না। ঐদিন লিভোলিন, ফোরাকর্ট ইনগেলার শুরু করা হল। কাশির জন্য রাতে ভাল করে ঘুমাতে পারতাম না। পরদিন মঙ্গলবার কাশি আরো বাড়তে লাগল। রাতে আরো বেড়ে গেল। অক্সিজেন দেওয়া হল। বিশেষ কোন আরাম হল না। সম্ভবতঃ রাত তিনটের সময় আধোঘুমের মধ্যে আমাকে বলা হল কাশি কমানোর একটা ওষুধ দিচ্ছি খেয়ে নিন। আধোঘুমে খেয়ে নিলাম। একটু পরে ঘুমিয়ে পড়লাম। তিন ঘণ্টা পরে ঘুম ভেঙে দেখলাম কাশি প্রায় উধাও। জিজ্ঞেস করলাম কী ওষুধ ছিল। বলল মেড্রল ট্যাবলেট ১৬ মিগ্রা। মিথাইল প্রেডনিসোলোন স্টেরয়েড। ডাক্তারকে বললাম স্টেরয়েডকে ম্যাজিক ভাবতাম, এ তো সত্যিই তাই হল আমার ক্ষেত্রে। নিজের জীবনে ম্যাজিক দেখলাম। মোট ছয় দিন মেড্রল খেয়েছি।

তার মানে, আমার ক্ষেত্রে কোভিড যে সাইটোকাইনের প্রবল ঝড় ঘটে সেটা হয়েছে আমার গলার উপরি অংশে ফ্যারিংস, ট্র্যাকিয়া ব্রঙ্কাসের মধ্যে। আরো নীচে রয়েছে ফুসফুস, সেখানে কিছু হয়নি। ফুসফুসে হলে ভেন্টিলেটরের সাহায্য লাগে। সাইটোকাইনের ঝড় থামাতে স্টেরয়েড মোক্ষম কাজ দিয়েছে। হাসপাতালে ভর্তির সাতদিন আগে আমার চেম্বারে এক রোগী

জ্বর কাশি তীব্র মাথার যন্ত্রণা নিয়ে এসেছিল। প্রথমে ডেঙ্গি, পরে ম্যালেরিয়া নেগেটিভ হওয়ায় কোভিড টেস্ট করতে পাঠাই। আমি ছয় ফুট দূরে বসিয়ে মার্চ মাস থেকে নিয়মিত রোগী দেখে গেছি। কিন্তু এই রোগী হঠাৎ আমার খুব কাছে চলে আসে এবং কেশেও ফেলে। ঐ রোগী কোভিড পজিটিভ জানার পরেই ৩০ জুলাই চেম্বার বন্ধ করে দিই। সেইসঙ্গে ঘণ্টায় ঘণ্টায় গরম জল, ফেনোফাইব্রেট ওষুধ খেতে শুরু করি। হয়ত তার ফলে কোভিড গলা থেকে বেশি নীচে নামতে পারেনি। এটা আমার অনুমান।

বুকের ভিতরের কষ্টটা যে হার্টের সেটা বুঝতে পেরেছিলাম সঠিকভাবে। তাই খুব দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে গিয়েছিলাম। দশ দিন হাসপাতালে থেকে ১৪ আগস্ট দুপুরে বাড়ি ফিরে এসেছি। বাড়িতে ১৪ দিন আইসোলেশনে ছিলাম একটা ঘরে। ক্রমশ ভাল হয়ে উঠছি। ক্ষিদে ফিরেছে, দুর্বলতা কমেছে। ৩ আগস্ট ছিল আমার ৭০ তম জন্মদিন।

কোভিডের আক্রমণ যেন সর্বগ্রাসী দাবানল, কার যে কী ক্ষতি হবে বলা দুরূহ।

সায়াহ্নের সুখের খোঁজে

অশোক রঞ্জন ধর

সবাইকে একটা নির্দিষ্ট বয়সে কর্মজীবন থেকে অবসর নিতে হয়। সেটা স্বেচ্ছায় হতে পারে আবার অনিচ্ছায়ও হতে পারে। আমাদের দেশে অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ বৎসর। এই সময় থেকেই এঁদের গায়ে প্রবীণ নাগরিক তকমা এঁটে যায়।

কর্ম থেকে অবসর নিলেও জীবন থেমে থাকে না। জীবনতরী বেয়ে চলতেই হয় সবাইকে। এই চলা যাতে সুখের, স্বচ্ছন্দের ও আনন্দের হয় সেই চেষ্টা অনবরত করতে হচ্ছে। মহাভারত থেকে জানতে পারি যক্ষরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন, "সুখী কে?" উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন যিনি "অপ্রবাসী ও ঋণশূন্য হইয়া দিনের পঞ্চম বা ষষ্ঠভাগে আপনগৃহে শাক-পাক করেন তিনিই সুখী।" এ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে পুরাকাল থেকে সুখের সন্ধান চলেছে এবং এখনও আমরা সেই খোঁজে ছুটে চলেছি। যেহেতু চাহিদার শেষ নেই এই ছুটে চলারও শেষ নেই।

প্রবীণ বয়সে পৌঁছে জীবনে যা পেয়েছি তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অবিমিশ্র সুখ জীবনে কখনো আসে না তবে কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চললে সুখের সন্ধান না পেলেও হয়তো স্বস্তিতে জীবনের শেষ অধ্যায়টা পার করে দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

সুখী জীবনের জন্য সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। যে কেন রোগই সুখী জীবনের পরিপন্থী। সেজন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা প্রয়োজন। নিজের অসুখের কথা পরিবারের লোকেদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত।

অবশ্যই আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকতে হবে। এর মানে এই নয় যে প্রচুর অর্থের মালিক হতে হবে। নিজের এবং নির্ভরশীল সদস্যের ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা, বিনোদন, একটু বাইরে বেড়ানো ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান থাকতে হবে। প্রয়োজনীয় খরচের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হলে বা ধার করতে হলে খুবই হীনমন্যতায় ভুগতে হয়—যা অবশ্যই কাম্য নয়। সেজন্য অবসর গ্রহণের অনেক আগেই ভবিষ্যৎ জীবনের একটি পরিকল্পনা করে রাখতে হবে।

নিজের-সম্পূর্ণভাবে নিজের একটি বাড়ি থাকা প্রয়োজন। ভাড়া বাড়ির সঙ্গে আপন নীড়ের কোন তুলনা হয় না। বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে যদি সামান্য খালি জায়গা থাকে—তাতে নিজের হাতে ২/১টি গাছ লাগালে মনে যে প্রশান্তি আসে তা

তুলনাহীন। এ জন্যই বোধ হয় কবি বলেছেন—

"ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা
করেছিনু আশা।"

দরকার মনের মতো একজন সঙ্গী। তিনি হতে পারেন স্বামী/স্ত্রী বা কোন বন্ধু। যার সঙ্গে জীবনের সুখ-দুঃখ সবকিছুই ভাগ করে নেওয়া যায়। আবার অবসর সময়ের আলাপ আলোচনা, আড্ডা বা দল বেঁধে কোথাও বেড়ানোর জন্য প্রয়োজন সময়বয়সী একদল বন্ধু।

অবসর সময়ের কিছুটা অংশ সুন্দরভাবে কাটানোর জন্য একটা হবি (Hobby) থাকা ভাল—যেমন বাগান করা, ছবি আঁকা, বইপড়া, গান করা বা শোনা, লেখা-লেখি করা ইত্যাদি।

নতুন কোন বিষয় যা এতদিন সময় বা সুযোগের অভাবে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শেখা হয়ে ওঠেনি তা শেখার চেষ্টা করা যেতে পারে।

জীবনে যারা বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ ও সামর্থে আমাকে/আপনাকে ছাড়িয়ে গেছে তাদের প্রতি কোন ঈর্ষা বা দ্বেষ পোষণ না করলে মনে প্রশান্তি আসবে।

কোন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে সামান্য কিছু কাজ করতে পারলেও মনে অপরিসীম আনন্দ পাওয়া যায়।

বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদের সংসারের সকল বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া, অযাচিত উপদেশ দেওয়া, নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা পছন্দ-অপছন্দের বিষয়ে সোচ্চার হওয়া কখনই উচিত নয়।

চলার পথে যদি কখনো সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়তে হয় বা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে থাকা মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে ওঠে সেক্ষেত্রে বৃদ্ধাশ্রমে চলে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

স্নেহ-মায়া-মমতা ও জীবনের সহায়-সম্বল ও পরিশ্রম দিয়ে যারা নবীন প্রজন্মকে লালন পালন করেছেন ও সুখী রাখতে চেষ্টা করেছেন তারা যাতে জীবনের শেষ অধ্যায়টি সুখে ও শান্তিতে কাটাতে পারেন সে বিষয়ে আমাদের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

দুশো বছর পর বিদ্যাসাগর

গৌতম রায়চৌধুরী

১৮২০-র ২৩ সেপ্টেম্বরে বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন। দুশো বছর পরও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালি মন ও মননে সমুজ্জ্বল। তাঁর কথা বলতে বা শুনতে আমরা গর্ব অনুভব করি। কোন বিদ্যাসাগরের কথা শুনতে আমাদের বেশি ভালো লাগে? অবশ্যই 'দয়ার সাগর' বিদ্যাসাগরের কথা। তাছাড়া তাঁর শিক্ষাচিন্তা, যুক্তিবাদী-ভাবনা, ক্লাসিকাল ভাষা ও শাস্ত্রচর্চা এবং ধর্ম সমালোচনার মাধ্যমে মানববাদী চিন্তা তৎকালীন বাঙালি হিন্দু সমাজে নবযুগের আলোকবর্তিকা নিয়ে এসেছিল। সে আলোর ছঠায় আজও আমরা মুগ্ধ। বিধবাবিবাহ রদ, বহুবিবাহ বন্ধের চেষ্টার মধ্যে তাঁর সামাজিক ভূমিকার বাঙালি তথা সমগ্র ভারতবাসীকে আজও মুগ্ধ করে। উপরন্তু ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র মাধ্যমেই বাংলা গদ্যের নতুন যুগের সূচনা হয়। পদ্যের অন্তর্নিহিত ছন্দকে উনিই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সহ অনেকেই বিদ্যাসাগরকে কেবল পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা ও অনুবাদক বলেই মনে করতেন এবং সাহিত্যিক মর্যাদা দিতে চাননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে 'বর্ণপরিচয়ের' 'জল পড়ে পাতা নড়ে'-কে তাঁর জীবনের আদি কবির প্রথম কবিতা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ১৮৫৫-এর পয়লা বৈশাখে প্রকাশিত 'বর্ণপরিচয়'কে অতিক্রম করার মতো আর কোনো বই তো আজও প্রকাশিত হয়নি। একমাত্র যোগীন্দ্রনাথের 'হাসিখুশি'র নাম মনে পড়ে।

'বর্ণপরিচয়ের' গোপাল, রাখাল, ভুবন ও ভুবনের মাসি—এরা অমর।

কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ অন্যভাবে বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করব। প্রথমত, আজকের এই সন্ত্রাসের দিনে, যে কোনো বিরোধী মতকে রাষ্ট্রবিরোধী আখ্যা দিয়ে শারীরিক ও সামাজিক ভাবে হেয় করতে দিলে, বিদ্যাসাগর কী তাঁর সমাজ সংস্কারের কাজ করতেন? সাম্প্রদায়িক/কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বীর যোদ্ধারা গুলিবিদ্ধ বা সাজানো অপবাদে কারান্তরালে রুদ্ধ, দেশের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ তখনও কী বিদ্যাসাগর স্থিতাবস্থা কায়েমকারী সামাজিক কাঠামোকে আঘাত করতে পারতেন? দ্বিতীয়ত, করোনা অতিমারির সময়েও কী তিনি রোগার্তকে সেবা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান করতেন? কিছুটা কল্পনার সাহায্যে, কিছুটা ইতিহাসের সাহায্যে আমরা উক্ত দুই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

১৮৪১ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম পণ্ডিত হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৮৬৬ সালে এক দুর্ঘটনায় যকৃতে গুরুতর আঘাত পান। এরপর তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল। ১৮৯৯-এর ২৯ জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়। বিদ্যাসাগরকে তাঁর পঁচিশ বছরের কর্মজীবনে, তিন শত্রুর বিরুদ্ধে প্রবল লড়াই করতে হয়েছিল। প্রথম তৎকালীন বাঙালি হিন্দু সমাজ, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ইংরেজ রাজপুরুষ এবং সমসাময়িক হিন্দু সমাজকর্তা। এই ত্রিশত্রুর বিরুদ্ধে তিনি অকুতোভয়ে লড়াই করেছেন। ইংরেজ রাজপুরুষের মধ্যে কয়েকজন বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ হলেও অনেকেই ছিলেন তাঁর তীব্র বিরোধী। এদের সঙ্গে তিনি সমানতালে টক্কর দিয়েছেন। তাই তো সভ্যতাভিমানী কার সাহেবের বুট জুতার প্রতিবাদে তালতলার চটি সগর্বে তুলতে পারেন এবং ঘোষণা করতে পরেন যে "ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতা শুদ্ধ পা-খানা তুলিয়া টক করিয়া লাথি মারিতে না পারি।"

প্রথমে স্বনামধন্য বীটন সাহেব ও পরে ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবের সহায়তায় বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলি ও নদিয়ায় ৩৫টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এই নিয়ে ভারত সরকারের কাছ থেকে নানা বাধা আসে, সরকার ওই সকল বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে পাঁচশো টাকা মাইনের সরকারি চাকরি ছেড়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, বালিকা বিদ্যালয়গুলি চালানোর জন্য তিনি একটি নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার খুললেন; তাতে নিয়মিত চাঁদা দিতেন কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। সেই চাঁদার টাকায় বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়গুলি বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। সবাই যখন চাকরি বজায় রাখতে নানা সমঝোতা করছিলেন (বঙ্কিমচন্দ্রও ব্যতিক্রম নন), তখন বিদ্যাসাগর এক নয়, একাধিকবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন।

বিধবা বিবাহ প্রবর্তন নিজের বিবেচনায় বিদ্যাসাগরের জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। মানবপ্রীতি ও নারীত্বের প্রতি সম্মান থেকে তিনি বিধবাবিবাহ আন্দোলন শুরু করেন। বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণে তিনি যে অক্লান্ত চেষ্টা করেছিলেন, কারণ যে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর আবেদন তারা শাস্ত্রের কঠিন বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। শাস্ত্রবচনের উদ্ধৃতি তাঁর নিজের জন্য আবশ্যক ছিল না, শাস্ত্রকে অবলম্বন করেই তিনি রক্ষণশীলতার দুর্গে আঘাত হানতে চেয়েছিলেন।

তাঁর সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রচর্চা এবং ধর্মালোচনা তাঁর মানবতাবাদেরই পরিপোষক অস্ত্র ছিল। ১৮৫৫-এর জানুয়ারি মাসে 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশিত হল। ভীমরুলের চাকে যেন ঘা পড়ল। দেশব্যাপী তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হল। বহু পণ্ডিত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। এ রকম একুশ জনের যুক্তি খণ্ডন করে বিদ্যাসাগর তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক ১৮৫৫-এর আরেকবার প্রকাশ করলেন, কলেবরের দিক থেকে প্রথমটির প্রায় আটগুণ। অবশ্য, শুধু শাস্ত্রকে উদ্ধৃত করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, শাস্ত্রনিরপেক্ষ আইনপ্রণয়ের চেষ্টায় তাঁর ক্লান্তি ছিল না। কারণ আইনের ক্ষমতা আরো বেশি, তার বিস্তার আরও ব্যাপক। তাই আইন-প্রণয়নের আন্দোলন। তিনি স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু করলেন এবং সমাজসংগ্রামের আরেকটি অস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষা দিয়ে গেলেন। অবশ্য স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে প্রতিপক্ষ তাকে অনেক পেছনে ফেলে দিয়েছিল। বিদ্যাসাগর প্রথমে এক হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ একটি আবেদনপত্র সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন, পরে আর একটি আবেদনপত্র আরো চার হাজার লোকের স্বাক্ষর ছিল। অপরপক্ষে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করে ৩৭ হাজার স্বাক্ষরকারীসহ ৫০ থেকে ৩০ হাজার ব্যক্তি পাল্টা আবেদন পাঠিয়েছিলেন। শুধু সংখ্যায় নয়, সামাজিক গুরুত্ব/প্রতিপত্তিতেও বিরোধীরা অনেক উপরে ছিল। এ সত্ত্বেও ১৮৫৫ সালের ২৬ জুলাই বিধাবাবিবাহ আইন পাস হয়ে গেল। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় প্রথম বিধবাবিবাহ দিলেন। বহু অর্থ তাঁকে ব্যয় করতে হত। এমনকি মারাত্মক ঋণজ্বালে জড়িয়ে পড়েন। পথেঘাটে টিটকারী, গালাগালি শুনতে হত। 'শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিররোগী হয়ে'—খেউড় গানে কলকাতা তখন মুখরিত। গালাগালির বহর দেখে পিতা ঠাকুরদাস, বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন, "তোমাকে আর আমার শ্রাদ্ধ করতে হবে না।" সামাজিক ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে একঘরে হতে হয়েছিল। এমনকি বঙ্কিম তাঁর চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন, 'বিদ্যাসাগর পণ্ডিত হলে, মুর্খ কে!' কিন্তু তিনি কোনো বাধাবিপত্তি গ্রাহ্য করেননি। শুধু কী সামাজিক অপমান, শারীরিক নিগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছিল, তাঁর প্রাণনাশের জন্য, আজকের ভাষায় 'সুপারি' দেওয়া হয়েছিল। অকুতোভয় বিদ্যাসাগর যিনি গুণ্ডানিয়োগ করেছিলেন সেই জমিদারের কাছারিতে নিজের প্রাণনাশের আর্জি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। পরে অবশ্য তিনি চলাফেরার সময়, ঠাকুরদাস প্রেরিত জেলে সর্দার, লাঠিয়াল শ্রীমন্তকে সঙ্গে রাখতেন।

দৃঢ় বিশ্বাস আজকের তিহার জেল বা সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রোলিং বা ধামাধরা চ্যানেল/ কাগজের সমালোচনা তাঁকে আটকে রাখতে পারত না।

তিনটি প্রসঙ্গের আলোচনা করে আমরা করোনা অতিমারির সময়ে, বিদ্যাসাগরের সেবাকার্যের পর্যালোচনা করব।

বিদ্যাসাগরের ছাত্রাবস্থায় কলকাতা বাসযোগ্য ছিল না। কলেরা, ম্যালেরিয়া ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রাবাসে সারারাত জেগে ওলাওঠা রোগীর সেবা করেছেন, পরবর্তীকালে, ১৮৪৭ সালে তাঁর সবচেয়ে প্রিয়, চতুর্থ ভাই হরচন্দ্র মাত্র ১২ বছর বয়সে কলেরায় মারা যান। এই মৃত্যু বিদ্যাসাগরকে খুব দুঃখ দিয়েছিল, কারণ বুদ্ধিমান এই ভাইটির উপর বিদ্যাসাগরের অনেক আশা ছিল। কিন্তু এই মৃত্যু তাঁর সেবাধর্মে ছেদ টানতে পারেনি।

১৮৬৭ সালে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। এই সময়ে তিনি দুর্ভিক্ষের প্রকৃত বিবরণ ইংরেজ কর্মচারীদের গোচরে আনেন এবং

প্রতিনিয়ত পত্রাঘাতে তাঁদের ব্যস্ত করে তোলেন। তাঁর প্রয়াসে মেদিনীপুর ও হুগলি জেলার বিভিন্ন স্থানে সরকারি খরচে অন্নসত্র খোলা হয়েছিল। তিনি স্বয়ং বীরসিংহ গ্রামে শ্রাবণ মাসে অন্নসত্র স্থাপন করেন এবং দীর্ঘ পাঁচ মাস অসংখ্য লোককে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান। এই অন্নসত্রে ১২ জন রান্নার লোক ও ২০ জন পরিবেশক ছিল, প্রথম প্রথম ১০০/২০০ লোক খেত, পরে সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। যারা অন্নসত্রে খাবার জন্য লজ্জা পেতেন তাদের গোপনে বাড়িতে খাবার এবং শাড়ি পৌঁছে দেওয়া হত। স্নানের জন্য তেলের ব্যবস্থা করেছিলেন। দলিত গরিবদের পাছে অযত্ন হয়, তাই তিনি নারী-পুরুষের মাথায় তেল মাখিয়ে দিতেন। এমনকি গর্ভবতী মহিলাদের সাধভক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। বর্তমান শ্রমজীবী কিচেনের উদ্ভাবক কিন্তু বিদ্যাসাগর।

১৮৬৯ সালে ম্যালেরিয়া বর্ধমান শহরে মহামারির আকার নেয়। ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্রকে নিয়ে বিদ্যাসাগর সেবাকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কুইনিনের দাম বেশি বলে ডা: গঙ্গানারায়ণ সিঙ্কোনা ব্যবহারের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর বললেন. ‘‘যখন পীড়া একই প্রকারের, তখন বড়লোক ও দরিদ্র ব্যক্তিনির্বিশেষে একই প্রকারই ওষুধ খাওয়া উচিত।” তিনি হিন্দু নমশুদ্র ও মুসলমান নির্বিশেষে সকলের ঘরে ঘরে গিয়ে ওষুধ ও পথ্য দিতেন। অনেক সময়ই, রোগা, রুগ্ন মুসলমান শিশুরা বিদ্যাসাগরের কোলে খেলা করত। পণ্ডিতের শরীর কিন্তু তাতে অপবিত্র হয়নি। তাঁর একক চেষ্টায় ব্রিটিশ সরকার বর্ধমানে বেশ কয়েকজন সিভিল সার্জন নিয়োগ করতে বাধ্য হন।

আমরা স্থির নিশ্চিত, এই করোনাকালে তিনি বেঁচে থাকলে ডাক্তার-ওষুধ নিয়ে ছুটে যেতেন গ্রামে গ্রামান্তরে। এই অতিমারির সময় আমরা যারা ছুটকো-ছাটকা টাকা ছিটিয়ে নাম কিনেছি, বিদ্যাসাগরের সামনে তাদের মাথা নত হয়ে আসে।

অতএব প্রমাণ হল, দুশো বছর পরও বিদ্যাসাগর শুধু প্রাসঙ্গিক নয়, আবশ্যিক। কর্মহারা, অন্নহারা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই সুযোগটাই হতে পারে তাঁর দ্বিশততম বর্ষ উদ্‌যাপনের প্রকৃত পথ।

সমগ্র ভারতে এই রাজ্যেই প্রবীণরা বেশি নিপীড়িত

রমাপ্রসন্ন দত্ত

চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শিক্ষার বিকাশের সাথে সাথে আমাদের গড় আয়ু ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। আর তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে প্রবীণ মানুষের সংখ্যা আমাদের সমাজে ক্রমবর্ধমান। স্বাধীনতার পূর্বে গড় আয়ু ছিল ৩২ বছর, আর বর্তমানে সেটি প্রায় ৬৮ বছর হয়েছে। আমাদের চারিদিকে এই ভাবে প্রবীণ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি তাঁদের জীবনে বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। যত বয়স বাড়ছে প্রবীণ মানুষের চিকিৎসা ও উপযুক্ত যত্নের অধিক প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। অপরের উপর দৈনন্দিন কাজে নির্ভরতা বিশেষভাবে দেখা যায়। স্বাধীনতার ৭৩ বছর পার পরেও দেশে প্রবীণ মানুষের কল্যাণে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। প্রবীণদের জন্য জাতীয় নীতি (national Policy) অথবা রাজ্য নীতি (State Policy) গ্রহণ করার বিষয়ে অকারণে বিলম্ব করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ তার ব্যতিক্রম নয়। এর জন্য নারী শিশু বিকাশ ও সমাজ কল্যাণ বিভাগের বিশেষ ভূমিকা অনস্বীকার্য। ফলে প্রবীণদের জীবনে নানা সমস্যা প্রকট রূপে দেখা যায়। বর্তমানে সমজে প্রবীণদের ভালো রাখতে নবীনদের এবং সমগ্র দেশের একটি

বিরাট ভূমিকা আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেই দায়িত্ব পালিত হয় না। ফলে তাদের নিদারুণ অসুবিধার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। প্রবীণ মানুষকে অনেক সময় অনাদর, অবহেলা ও অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে। সেই সকল আত্মজদের নিকট থেকে যাদের জন্য তাঁর অনেক ত্যাগ, কষ্ট ও সংগ্রাম করেছেন। যদিও বারবার আদালত সতর্ক করছেন প্রবীণাদের ভরণপোষণের জন্য এবং উপযুক্ত মর্যাদায় যাতে তাঁরা পরিবারে বসবাস করতে পারেন। ভারত সরকার পিতামাতা এবং বয়স্ক নাগরিকদের ভরণ পোষণ এবং কল্যাণমূলক আইন, ২০০৭ প্রণয় করেছেন। আর আমাদের রাজ্যে এই আইন ২০০৯ সাল থেকে কার্যকর হয়েছে। প্রবীণদের প্রতি যাতে অবহেলা ও অত্যাচার বন্ধ হয় তার পদক্ষেপ এই আইনে গৃহীত হয়েছে। এখন দেখা যাক সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় প্রবীণরা কেমন আছেন?

একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে সমগ্র ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রবীণদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সব থেকে বেশি। অবিশ্বাস্য মনে হলেও কলকাতা শহর সারা ভারতে প্রবীণদের প্রতি অত্যাচারে শীর্ষে অবস্থান করছে। এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সমীক্ষাটি দেখা যাক।

দেশের অন্যান্য বড় শহরের তুলনায় কলকাতায় বাড়ির বয়স্কদের উপর অত্যাচারের হার অনেক বেশি। সম্প্রতি দেশের প্রায় নয়টি বড় শহরে সমীক্ষা চালানোর পর এই তথ্য তুলে ধরেছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। 'এল্ডার অ্যাবিউস অ্যান্ড ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক এই সমীক্ষায় যে তথ্য উঠে এসেছে তাতে বলা হয়েছে, দেশের মধ্যে কলকাতায় প্রবীণ মানুষেরা সবথেকে বেশি নিগৃহীত ও নিপীড়িত।

সমীক্ষকরা জানিয়েছেন, ভারতে মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতিত প্রবীণদের সংখ্যা প্রায় ন'কোটি ছাড়িয়েছে। সব ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, নিজেদের বাড়িতেই তাঁদের সবথেকে বেশি নিগৃহীত হতে হচ্ছে। ৬০ শতাংশ প্রবীণ মানসিক ও ৪০ শতাংশ প্রবীণ শারীরিকভাবে নির্যাতিত।

ভারতে কোথায় কতজন প্রবীণকে নিগৃহীত হতে হয়, তার উত্তর খুঁজতেই কয়েক মাস আগে দেশজুড়ে সমীক্ষা চালান ওই সমীক্ষকরা। দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, পাটনা, আমেদাবাদ ও ভোপালের প্রবীণ মানুষদের নিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে তাঁরা দেখতে পেয়েছেন, কলকাতার প্রবীণরা সবথেকে বেশি খারাপ অবস্থায় আছেন। সমীক্ষকদের পক্ষ থেকে এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে দেশের ৫২ শতাংশ প্রবীণ-প্রবীণারাই স্বল্প শিক্ষিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদেরই সর্বাপেক্ষা নির্যাতিত হতে দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে আবার ২৩ শতাংশ নির্যাতিত প্রবীণ শহরে বাস করেন। তাঁদের মধ্যে ৭২ শতাশ নিজেদের ছেলেদের সঙ্গে থাকেন আর ২৬ শতাংশ থাকেন মেয়েদের সঙ্গে। দেখা গিয়েছে, দেশের ৮০ শতাংশ নিগৃহীত ও নিপীড়িত মানুষেরই বয়স ৭০-৮০ বছরের মধ্যে।

কলকাতার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে সব প্রবীণ অর্থনৈতিকভাবে সন্তানদের উপরে অধিক নির্ভরশীল, তাঁরাই সবথেকে নির্যাতিত। গত তিন বছরে এই হার আরও বেড়েছে। সমীক্ষায় আরও একটি চাঞ্চল্যকরতথ্য উঠে এসেছে, তা হল, দিল্লিতে প্রায় ৭৬ শতাংশ প্রবীণদের নিজস্ব বাড়ি থাকলেও কলকাতায় সেই হার মাত্র ১৫ শতাংশ।

সমীক্ষকদের মতে, মূলত সঠিক শিক্ষার অভাবেই আমাদের সমাজব্যবস্থায় প্রবীণদের নিগৃহীত হতে হচ্ছে। পরিবার ক্রমশ ছোট হতে থাকায় প্রবীণরা স্বাস্থ্য, আর্থিক নিরাপত্তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নির্যাতিত হচ্ছেন। বর্তমানে অণু পরিবারে এটি আরও প্রকট। উপরিউক্ত সমীক্ষা থেকে এই কথাই প্রতীয়মান হয় যে সমাজে প্রবীণদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। সমাজে হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রাখা দরকার। নতুবা

আগামী দিনে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার ও পীড়ন ভায়াবহ রূপে দেখা দেবে। প্রবীণ মানুষকে যাতে সর্বস্বান্ত হয়ে পথে না দাঁড়াতে হয়, তার জন্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের বিষয়ে আইনের মাধ্যমে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল সংস্কারের ব্যবস্থা করা, যাতে প্রাথমিক থেকে কলেজ স্তর পর্যন্ত প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা জাগরিত হয় ও মানবিক গুণের বিকাশ সাধণ করা যায়। এছাড়া বার্ধক্য বিজ্ঞানের বিষয় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। সারা ভারতে প্রবীণ মানুষ যাতে শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম, মর্যদা নিয়ে নির্ভয়ে শান্তিতে বাস করতে পারেন তার জন্য সমাজের সকলের দায়িত্ব অনস্বীকার্য। সর্বোপরি সরকারকে প্রবীণদের জাতীয় নীতি গ্রহণ করে এই সমস্যার আমূল সংস্কার ও পরিবর্তনের পথে এগিয়ে চলতে হবে, যাতে সুসংহত পরিকল্পনার মাধ্যমে আগামা দুই বৎসরের মধ্যে এই বিরাট সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

কোভিড-১৯ তহবিল

আমরা "কোভিড-১৯" তহবিল গঠন করেছি। সবাইকে মুক্ত হস্তে দান করার জন্য অনুরোধ জানাই। উক্ত অনুরোধে সাড়া দিয়ে যারা অর্থ প্রদান করেছেন তাদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল।

তাছাড়া আমাদের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধ করা হচ্ছে সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যথাসম্ভব অনুদান প্রদান করার। ৮০ জি ছাড়ের ব্যবস্থা আছে। ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সরাসরি আমাদের নিম্নলিখিত Bank A/c এ দান করতে পারেন

Central Bank of India, P.A. Shah Road Br. SBA/C No-1537325386
Bank's IFCS Code CBIN0281663

COVID-19 FUND

SI no	Name	Amount
1	M. K. Maheswari	500/-
2	Mrinal Dutta	3000/-
3	Pelab Mukherjee	500/-
4	Smt. Chhaya Mukherjee	500/-
5	SmtShakti Bose	1000/-
6	Goutam Roy Chowdhury	1500/-
7	Ram Raman Bhattacharya	5000/-
8	Snehungshu Chakder	500/-
9	Smt. Sikta Das	500/-
10	Tapati Biswas Chowdhury	500/-
11	Rathin Maitra	500/-
12	Putul Maitra	300/-
13	Ranjan Maitra	200/-
14	Dr. Biren Majumder	200/-
15	Anup Roy	200/-
16	Manab Chakraborty	500/-
17	Uma Saha	200/-
18	Esha Mitra	500/-
19	Dipesh Mitra	1000/-
20	Smt. Namita Mitra	500/-
21	Narayan Ghosh	300/-
22	PrabirDey	100/-
23	Sutapa Chatterjee	100/-
24	Mita Das	100/-
25	Anna Bhadra	100/-
26	Binoy Raha	100/-
27	Pras'enjit'Dey	200/-
28	S. L. Ganesh	100/-
29	Debesh Bhattacherjee	1000/-
30	Joysree Gupta	100/-
31	Arun Mukherjee	100/-
32	Kalyan Kr. Mukherjee	100/-
33	Su'bhra Roy Chowdhury	700/-
34	Krishna Ghosh	300/-
35	Karabi Lahiri	300/-
36	Manashi Ghosh	150/-
37	Gita Dutta	100/-
38	Bina Chakraborty	500/-

39	Santi Das	100/-
40	Pras.anta Lahiri	300/-
41	Kamal Paul	100/-
42	Chhabi Paul	100/-
43	Amita Mondal	100/-
44	Sailen Sarkar	100/-
45	Aloka Mitra	1000/-
46	BhaSkar Bhaduri	150/-
47	Radha Dutta	500/-
48	Ashok Ranjan Dhar	500/-
49	Tripti Rani Bhadra	500/-
50	Suprakash Bose	100/-.
51	Rama Prasanna Dutta	500/-
52	Mira Basu	500/-
	Total	**26,600/-**

বার্ষিক সাধারণ সভা

করোনার কথা মাথায় রেখে সংস্থাগুলিকে ২০১৯-২০ সালের বার্ষিক সাধারণ সভা করতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দিল কেন্দ্র। এই সময় ছিল ৩০ সেপেম্বর পর্যন্ত।

পরিচালন পরিষদের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে বর্দ্ধিত সময়ের মধ্যে সাধারণ সভার দিন ঠিক করা হবে।

বিজ্ঞপ্তি

প্রতি বছরের মত এ বছরও ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে ২০২০-২১ সালের সদস্যপদ নবীকরণ হওয়ার কথা। কিন্তু Covid-19 এর কারণে অনেকের পক্ষেই একাজ করা সম্ভব হয়নি। সকলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে আপনাদের সদস্যপদ নবীকরণ করুন এবং পরিচিতদের সদস্যপদ নবীকরণে সাহায্য করুন।

- বিজ্ঞাপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৭ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)

২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দূরভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস স্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৬-৭টা)

কম খরচে

রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর. সি. সহায়তা ১০ টাকা

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী (অর্থোপেডিক) এম.এস, ডি.এন.বি (অর্থো)
প্রতি মাসের ২য়/৪র্থ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা-৭টা

২) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার, সন্ধ্যে ৭টা-৯টা

৩) ডঃ বি. বাউর-এম.ডি. (জেনারেল মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা-৪টা

৪) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি এম. ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) মঙ্গলবার, ৮টা-৯টা

৫) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেস্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধ্যে ৮টা-৯টা

আবেদন ______________

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- Bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in